Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 01 - 08
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর সমাজ ও সাহিত্যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রভাব : একটি আলোচনা

মৌমিতা পাল
গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: moumitapaul965@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Chaitanyadeb, Bengali Literature, Influence, Society, Music, Culture, Philosophy, Baishnab.

Abstract
In the evolution of history, Mahaprabhu Shri Chaitanyadeb was a unique character, the ruler of time, and the lord of the era during the Middle Ages. His advent was a revolutionary event in Bengali literature. Mahaprabhu Chaitanyadeb spent 22 years in household life and became a sannyasi at the age of 24. His entire life was full of intense emotions. Centering his life consciousness, the social culture, religious practices of Bengalis—in a word, the entire process of creation and heartfelt love — was shaped. From the sixteenth to the eighteenth century, even in the modern scientific age, his life, character, and practice have created a profound and far-reaching interest in Bengali and beyond, so he can be called a man of the era. The entire society was awakened to a new life in the touch of Shri Chaitanyadeb's life and words. Just as the greens become vibrant when it rains on barren land.

Before his advent, Bengali literature was fragmented and limited due to various complex religious doctrines. The small doctrines transformed into a vast ocean in the tide of the intense emotions suggested by Shri Chaitanya deb. Chaitanya deb brought about a revolutionary change in Bengali social life based on emotion. This wave of emotion spread throughout the social psyche in a short time. Man got a place above the scriptures. The person who first took society outside the home, who had registered the name in the group of Baul outside the house, was Chaitanya deb himself. The immense emotion that was created in society due to his influence became unified in the form of Hindus and Muslims and was tied in one thread. As a result of the advent of Chaitanya deb, there was a renaissance in Bengal. A cultural circle was formed in Bangladesh centering on Chaitanya deb. Generally, it is known as Chaitanya culture or Chaitanya Renaissance. In Bengali

poetry, literature, art, sculpture—in all areas of national culture—the pure flame of Chaitanyadeb's life spread. Now the creative dance of that holy flame began. As a result of Chaitanyadeb's advent, there were various influences in society, culture, music, philosophy, and literature in contemporary and post-Chaitanya Middle Ages. The society and culture underwent changes, new inventions in music and drama, and originality in the field of literary creation. We will discuss the extensive side of the main subject in our main article.

Discussion

ইতিহাসের কাল বিবর্তনে মধ্যযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এক বিচিত্র চরিত্র কালাধিপতি ও কালের অধীশ্বর। তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী ঘটনা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ২২ বছর সংসার করেন এবং ২৪ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। তিনি বাংলায় একটি পদও লেখেননি। কিন্তু কেউ কেউ দাবি করেন তিনি দুটো পংক্তি লিখেছিলেন। আমরা জানি যে তিনি সংস্কৃতে মাত্র ৮টি শ্লোক অর্থাৎ 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া কিছুই রচনা করেননি। তাঁর সমস্ত জীবন ছিল ভাব জর্জর। তাঁর জীবনচেতনাকে কেন্দ্র করে বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মসাধনা — এক কথায় সর্ববিধ সৃজনপ্রক্রিয়া ও হৃদয়ানুরাগ সুদূরপ্রসারী আবর্ত রচনা করেছিল। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানালোচিত যুগেও তাঁর জীবন, চরিত্র ও সাধনা বাংলা ও বাংলার বাইরে সুস্থির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে, তাই তাঁকে যুগন্ধর পুরুষ বলা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও বাণীর স্পর্শে সমগ্র সমাজ জেগে উঠল নব জীবনের এক অভূতপূর্ব মহোল্লাসে। যেমন খরা মাটিতে বৃষ্টির জল পড়লে সবুজেরা সতেজ হয়ে ওঠে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে নানা সংকীর্ণ ধর্মীয় মতবাদের গোস্পদে ছিল খণ্ডিত ও সীমিত। শ্রীচৈতন্যদেবের সূচিত প্রবল ভাবের জোয়ারে সেই ক্ষুদ্র গোস্পদগুলি পরিণত হল বিশাল মহাসমুদ্রে। এক্ষেত্রে আধুনিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই বলেছেন তাঁর কবিতায়—

"ঘরের ছেলে চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"[১]

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রসঙ্গ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

"বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় সেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলে সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে প্রাচুর্যে ও প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।"[২]

চৈতন্যদেব বাঙালি সামাজিক জীবনে এনেছিলেন যে ভাবমূলক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, স্বল্পকালের মধ্যেই সেই ভাব তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল সমাজ মানসের সর্বত্র। শাস্ত্রের ঊর্ধ্বে স্থান পেল মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হল 'সবার উপরে মানুষ সত্য।'[৩] সমাজের মানুষকে যিনি প্রথম ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন, যিনি ঘর ছাড়া বাউলের দলে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং চৈতন্যদেব। তাঁর প্রভাবে সমাজে যে মহাভাবের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ভাব হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একাকার হয়ে একসূত্রে বাধিত হয়েছিল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সমকালে গড়ে উঠেছিল এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সাধারণভাবে তা চৈতন্য সংস্কৃতি বা চৈতন্য রেনেসাঁস নামে পরিচিত। বাংলা কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে— জাতীয় সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের পরিশুদ্ধ অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হয়ে গেল। এবার শুরু হয়ে গেল সেই পবিত্র অগ্নিশিখার সৃষ্টিমুখর নৃত্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে সমাজ, সংস্কৃতি, সংগীত, দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্যে বিভিন্নভাবে প্রভাব পড়েছিল চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর মধ্যযুগে। চৈতন্যদেবের ফলে

সমাজ ও সংস্কৃতির জগতে পরিবর্তন, সংগীত ও নাট্যকলায় নতুন উদ্ভাবন এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃষ্টির গ্রাহ্য অভিনবত্ব। এবার আমরা আমাদের প্রবন্ধের মূল বিষয়ের দিকটি আলোকপাত করার প্রয়াস করব।

সংগীত— চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধরণের সংগীত প্রচলিত হল। সেটি হল নাম সংকীর্তন। এই কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধা হয়েছিল। সমাজের কোনো জাতির মধ্যে ভেদ ভাব ছিল না। এই কীর্তন গানের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুরের ও কথার অন্বয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

আবার চৈতন্যোত্তর যুগে এই নাম সংকীর্তনকে বজায় রেখে পালাগান ও কীর্তনের ঢঙ ঢুকেছিল। মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় কীর্তন গানের চর্চা হত তিন ধরণের— ১. রেনেটি, ২. মনোহরশাহি এবং ৩. গড়ানহাটি।[৪] কীর্তনের চতুর্থ শাখা খুলেছিল বিষ্ণুপুরের রাজসভাকে কেন্দ্র করে, সেটি হল মান্দারনি বা মল্লভূমি। সেখানে ব্রাহ্মণ্যের ছাপ বেশি পড়েছিল। কিন্তু বেশি দূর বিস্তৃতি হতে পারেনি। রেনেটি এবং মনোহরশাহি হল দেশি গানের ঢঙ। সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ লাভ করেছিল মনোহরশাহি। কৃষ্ণলীলা, মাথুর, বিরহ পর্যায়ে মনোহরশাহির সুর রয়েছে। বৈঠকী কীর্তনকে সংকীর্তন আসরে উন্নীত করেছেন নরোত্তম দাস। অষ্টাদশ শেষে নারী কীর্তন শুরু হয়েছিল। সকলে বলতেন ঢপ কীর্তন। পদাবলি কীর্তনের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকে আরও দুটি পদ্ধতি চালু হয়েছিল। এদের পারিভাষিক ভাষায় বলা হত তুক ও ছুট। দুই ছত্র মিলিয়ে যে একটি সম্পূর্ণ পদ পাওয়া যায় তাকে তুক বলে। তুক আখরের মতো ব্যাখ্যার ভূমিকা নেয় না, বস্ত বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভূমিকা নেয়।

নাট্যকলার দিক থেকে কৃষ্ণলীলা যাত্রা পরিবর্তন আনে। প্রাক্ চৈতন্যযুগে বাংলায় রাসযাত্রা, শিব যাত্রা ছিল। সেন রাজারা এতে উৎসাহ দিয়েছিলেন হয়ত। চৈতন্যদেবের সময়ে কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায় রামানন্দের ভূমিকা থেকে। তিনি সেকালের একজন বিখ্যাত নাট্যাচার্য ছিলেন। সেসময় মহিলা অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় করানো হত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে আরো বিস্তৃত লাভ করে এই কৃষ্ণযাত্রার রূপ ও রীতি।

সমাজ ও সংস্কৃতি— চৈতন্যদেব বর্ণভেদকে ত্যাগ করে এক সাম্যবাদী আদর্শ গড়ে তোলেন। সমাজে নতুন বিপ্লবের সৃষ্টি হয় অসংখ্য মানুষ প্রথম ধর্মীয় কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হল। ঘোষিত হল মানবতার জয়।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙালি নারীর যে অবস্থান ছিল সেই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটল। বৈদিক যুগ থেকে নারীরা বঞ্চিতা ও অবহেলিতা। বিধবাদের শাস্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ ছিল এবং পুনর্বিবাহ দেওয়া যেত না। বৃহত্তর বাঙালি জীবনে এক নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। বিধবাদের পুনর্বিবাহ হত কণ্ঠী বদলের মাধ্যমে। মর্যাদা ফিরে পেয়ে নারীরা গুরুর মতো গোস্বামী হয়ে উঠল। যেমন— নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈত জায়া সীতা, শ্রীনিবাসের কন্যা জ্ঞানলতা ঠাকুরানি প্রমুখ সমাজে মান্য হলেন। সমগ্র দেশে কৃষ্ণের আরাধনার ধূম পড়ে গিয়েছিল। সমগ্র দেশে কৃষ্ণ ছাড়া যে কোনো গীত নেই সেই মতটি ছড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ থাকল না। মুসলমানেরাও সম্মান লাভ করল।

বৈষ্ণব সমাজে বিবাহ প্রথা খুব সহজ ও জটিলতাহীন হয়। কণ্ঠীবদলের মাধ্যমে বিবাহ শুরু হল। গান্ধর্ব মতে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে নির্বাচন করত। সেই নির্বাচন ছিল বর্ণ, গোত্রহীন।

চৈতন্যোত্তর সমাজে বিশেষ করে বৈষ্ণবদের মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দাহ করা হতো না। মাটির নীচে পুঁতে রাখা হত। বৈষ্ণবকে কেউ কেউ বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার হিন্দু বাউলদের সঙ্গে মুসলমানেরাও মিশে গিয়ে সাধনা করেছিলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যকে গুরু হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

দর্শনশাস্ত্র— চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করেই বাঙালির বৌদ্ধিক চেতনার স্ফুরণ ঘটল। চৈতন্য আনীত এই ভাব আন্দোলন বাংলাদেশে শুধু উত্তাল করেনি, বাঙালিকে প্রথম চিন্তার জগতে আহ্বান করে নিয়ে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেদিন বেদান্তকে কেন্দ্র করে যে ষড়্‌দর্শন রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বাংলার অবদান ছিল অন্যতম। শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে চৈতন্য বাংলাদেশে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতবাদের হাত ধরেই বাঙালির বৌদ্ধিক চেতনার সূচিত হল। শুধু তাই নয় বাংলার পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাব্যসমূহে সাদামাটা ভাষা

সেদিন দার্শনিক চেতনার বাহন হয়ে উঠল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দর্শন চিন্তার গূঢ়-গম্ভীর বিষয়কে বাংলা পয়ার ছন্দে পরিবেশন করলেন—

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন।।"[৫]

চৈতন্য ভাব আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হল বেদান্ত দর্শন গ্রন্থ— বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গোবিন্দভাষ্য', শ্রীজীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ।' শুধু জীব-জগত-ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে দর্শন শাস্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা নয়, বাংলাদেশে এই বৈষ্ণব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হল এক নতুন অলংকারশাস্ত্র শ্রীরূপ গোস্বামীর 'শ্রী শ্রী উজ্জ্বলনীলমণি' এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।' এককথায় সর্বভারতীয় পটভূমিতে ভক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচিত হলেও সাহিত্যের দর্শন, তার অলংকারশাস্ত্র রচিত হয়েছিল কেবলমাত্র বঙ্গদেশে।

সাহিত্য— সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের ফলে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্যে প্রভাব পড়েছিল। যেমন— পদাবলি সাহিত্য, চরিত সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান সাহিত্য ইত্যাদি।

পদাবলি সাহিত্য— বাঙালির গীতিসাহিত্যের গোমুখী উৎসকে যিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য সমাজে যে ভাব বিপ্লব এনেছিলেন তার গভীর প্রভাব মুদ্রিত হল বিশাল পদাবলি সাহিত্যে। চৈতন্যের আগেও বাংলাদেশে পদাবলি সাহিত্য ছিল, তবে হরিস্মরণের উপাদান হিসেবে নয় তা একান্তই জয়দেবের পদাংক হিসেবে বিলাসকলার বসনে—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।।"[৬]

প্রাক্ চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যে সকল পদ রচিত হয়েছিল, সেখানে মানব-মানবীর পার্থিব প্রেমই ছিল তার মূল ভিত্তি। কিন্তু চৈতন্যদেব সেই সব পদের রসাস্বাদন করায় সেগুলির ধর্মীয় ও কাব্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে পার্থিব মানব-মানবীর প্রেম অপার্থিব রাধাকৃষ্ণ প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে পদগুলির জন্মান্তর ঘটল। কাব্যের রসবিচারের নিরিখে চৈতন্যপূর্ব পদাবলিতে ছিল শান্ত রস ও দাস্য রস। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাবেই বাংলা পদাবলি সাহিত্যে যুক্ত হল সখ্য রস, বাৎসল্য রস ও মধুর রসের পদ। সঙ্গে যুক্ত হল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা। লৌকিক সম্পর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে চাইল ভক্ত। তাঁকে কাব্যের ক্ষেত্রে অলৌকিক করে তুললেন কবিরা। শুধু বিষয় নয় ভাষার ক্ষেত্রেও ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে এক অভূতপূর্ব শ্রুতিমাধুর্য দান করেছিল। চৈতন্যপূর্ব যুগে কাব্যভাষা হিসেবে ব্রজবুলি বিকশিত হল। কিন্তু এর বহুল ও বিলাসিত ব্যবহার চৈতন্যযুগ থেকেই গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রমুখ শক্তিশালী কবির হাতে ব্রজবুলি যেন নতুন শক্তিতে আবির্ভূত হল—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"[৭]

এমনকি আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ওই ব্রজবুলির ধ্বনি মাধুর্যের অনুসরণ করেছিলেন—

"গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো।।"[৮]

পদাবলিতে নতুন ধারা এসে যুক্ত হল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। যা কিছু কিছু অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে গৌরচন্দ্রিকায়। কৃষ্ণলীলার পদকীর্তনে কোনো কোনো পর্যায়ে প্রবেশের মুখে ভাব সাদৃশ্য অংকিত গৌর সংক্রান্ত পদগুলিকে পালাকার, অগ্রসর পর্যায়ের ভাবনাকে ধরিয়ে দিতেন শ্রোতাদের। এইসব পদে কবিরা অনুসরণ করেছিলেন চৈতন্যদেবের ভাবাবেগ ও আর্তি—

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।"[৯]

ষোড়শ শতক যে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে কীর্তিত হয় তারও কৃতিত্ব চৈতন্যদেবরই প্রাপ্য। ষোড়শ শতকের পদাবলি সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটল রূপানুরাগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস ও অভিসার পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় কবি গোবিন্দদাসের—

"কণ্টক গাড়ী কমল-সম-পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।"[১০]

চরিত সাহিত্য— চৈতন্যের জীবন ও জীবনচর্যার দিব্যজ্যোতি থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে বহু কবি বাংলা সাহিত্যের কক্ষ-কক্ষান্তরকে করে তুলেছিলেন আলোকিত। তাঁর দেবোপম চরিত্রকে ঘিরে প্রথমেই গড়ে উঠল চরিত সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে এতদিন কোনো চরিত সাহিত্য ছিল না। চৈতন্যদেবের মহাজীবনকে কেন্দ্র করে চরিত সাহিত্য গড়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের জ্যোতির্ময় জীবন তাঁর সমকালীন এবং উত্তরকালের বহু কবি-শিল্পীকে জীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', মুরারি গুপ্তের কড়চা, লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' সেই ভক্তিপূত প্রয়াসের সার্থক পরিণাম। বলাবাহুল্য এই ধারা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন।

চৈতন্যচরিত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।' এই গ্রন্থটি তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ। এর আগে তিনি দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সমগ্র মধ্যযুগে তাঁর মতো অগাধ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিরল। পাণ্ডিত্য ও মনীষার দিক থেকে দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিপুল পরিমাণ অধিকার ছিল তা চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে সুবিস্তৃত আছে—

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন।।"[১১]

চৈতন্যজীবনকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কৃষ্ণদাস এই কাব্যে মৌলিকতা দান করেননি, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যা তত্ত্ব ও দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে প্রয়োগ করেছেন।

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' আদি, মধ্য ও অন্ত্য— এই তিনটি লীলা পর্বে বিভক্ত। আদিলীলায় বৃন্দাবন দাসকে অনুসরণ করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম সরলভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের জন্য চৈতন্যদর্শনের আনুষ্ঠানিক ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করলেন। মধ্যলীলায় আছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থান পর্যন্ত ছয় বছরের জীবনকাহিনি। অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্যের শেষ আঠারো বছরের জীবনের বিস্তৃত পরিচয় আছে।

কৃষ্ণদাস বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান কৃতবিদ্য কবি ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। দূরহ ও জটিল তত্ত্বকথা কৃষ্ণদাসের হাতে একান্ত সহজ, সরল ও ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাম ও প্রেমের পার্থক্য বিচারে তিনি বলেছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।"[১২]

তাঁর গ্রন্থের প্রধান তাৎপর্য হল তিনি চৈতন্যের ধারাবাহিকভাবে চৈতন্য বৃত্তান্ত রচনা করতে চাননি, জীবনীকে অবলম্বন করে অত্যন্ত ভক্তি ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁর জীবনের পবিত্র আদর্শ বা জীবনামৃত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বৈষ্ণব মতে সৎ, চিত, আনন্দ একত্রে মহাভাব স্বরূপে উদ্‌গত হলে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্ভব ঘটে। রাধা হলেন সেই মনোভাব স্বরূপিনী। কৃষ্ণদাস লিখেছেন—

"হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।।"[১৩]

বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি— চৈতন্যের প্রভাবে সেদিন বাংলার মুসলমান সমাজেও যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেছেন যে, সেদিন চৈতন্যের প্রভাবে কাফের-পিরকে মুসলমান সমাজ পর্যন্ত নবঘনকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আসক্ত হয়ে লেখনী ধারণ করেছেন এবং তার ফলেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল। এই সকল কবিরা কেউ কেউ রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে শ্যামের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। মুসলমানেরা যাঁরা সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ পথ ত্যাগ করে হিন্দু-মুসলমান যুক্তসাধনার সাগর সঙ্গমে উপনিত হতে পেরেছেন তা একমাত্র চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে। অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক বাঙালি মুসলমান কবি বৈষ্ণবভাবের পদ লিখে বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই আমরা বাংলাদেশে পেয়েছি লালন ফকির, চাঁদ কাজী, শীতালাংসা, নশীর মামুদ এবং পরবর্তীকালে হাছন রাজা প্রমুখ। তাঁদের চৈতন্য বন্দনা এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য সাহিত্য— শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, ষোড়শ শতক এবং তৎপরবর্তীকালে লিখিত শাক্ত সাহিত্যেও চৈতন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত শাক্ত পদাবলির বাৎসল্য রসের পদগুলিতে এবং উমা-সংগীতে অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়ার গানে বৈষ্ণব পদাবলির কোমল স্নিগ্ধতা অনুভূত হয়।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যেও শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তিবাদের সার্বিক ভাব বিপ্লবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত বৈষ্ণব ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাঁদের কাব্যের পরিবেশ, চরিত্র এবং মৌল কাব্যরস সেই মতো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

এছাড়া মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এই কাব্যধারাতেও পরোক্ষভাবে চৈতন্য প্রভাব পড়েছে। চৈতন্যপূর্ব যুগে মনসা, চণ্ডীর যে ক্রুর, যুদ্ধংদেহী রূপ পরিলক্ষিত হয় সেই কর্কশ মনোভাবের পরিবর্তে কমনীয়তা, মানবীয় গুণ এসে পড়ে দেব-দেবী চরিত্রে। তবে চৈতন্য প্রভাবেই বৈষ্ণব কবিতার কান্ত কোমল স্পর্শে মঙ্গলকাব্যগুলির গ্রন্থনগত দৃঢ়তা শিথিল হয় সমালোচকের একথাও অনস্বীকার্য।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে সাহিত্যে যে সংস্কৃত শব্দযোজনা, বাক্‌নির্মিতি ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের যথাযথ ব্যবহার না হলে আজকের বাংলা সাহিত্যের ভাষা, উপভাষার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারত না। তৎসম শব্দ ব্যবহারের জন্য শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত পদকার ও গোস্বামীদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর প্রভাব না থাকলে ব্রজবুলি ভাষা এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার গঠন ও বিকাশে তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত ভাষানুযায়ী ঐশ্বর্যের পরিমিত প্রভাব পড়েছিল বলেই আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পৃথিবীর যেকোনো ঐশ্বর্যবান আধুনিক ভাষার সমকক্ষ হতে পেরেছে। সেজন্য চৈতন্যের আবির্ভাব প্রয়োজন ছিল।

শুধু তাই নয়, বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে লোকসংগীতে এবং লোকসাহিত্যেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পড়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মধুর স্পর্শ লাগল বাংলার সুদূর পল্লীর কবি কণ্ঠে। নাগরিক লোকসাহিত্য— কবিগান, যাত্রাগান, পাঁচালিতেও চৈতন্যদেবের প্রভাব পড়েছিল।

এইভাবে জাতীয় প্রাণচেতনায় ও ভাব-ভাষা চেতনায় শ্রীচৈতন্যের সার্বভৌম প্রভাব হয়েছে অব্যর্থ। কোনো মহামানবের জীবন এভাবে কোনো বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এমন গভীর এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। সমগ্র মধ্যযুগের সমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালের পূর্ণতা দান করেছেন তিনি। সাধারণভাবে বলা যায়, যেমন কানুকে ছাড়া কোনো গীত নাই তেমনি বলা যায় চৈতন্য প্রভাব ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরও অস্তিত্ব নাই। দেশ-কাল ও সমাজের নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন সত্তেও যে প্রেমধর্মের ভাবধারা সৃষ্টি করে তা শুধু বাংলায় নয়, বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চল এমনকি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতেও কোনো

কোনো ভক্তিমার্গের মধ্যে এখনো প্রচলিত আছে। সর্বোপরি তাঁর লোকোত্তর অনুপম জীবন বাংলা সাহিত্যের কক্ষে কক্ষান্তরে জ্বেলেছে অনির্বচনীয় আলো, তাঁর অলৌকিক পরশ পাথরের স্পর্শে কত মূল্যহীনকে করেছে সোনা।

Reference:

১. দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, কাব্য-সঞ্চয়ন (আমরা কবিতা), দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, সপ্তম কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ- ২০১১, পৃ. ২৯
২. আচার্য, ড. দেবেশকুমার (সম্পাদনা), প্রবন্ধ বিচিত্রা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, নবম পরিমার্জিত সংস্করণ- ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, সরস্বতী পূজা, পৃ. ৩
৩. Prothomalo.com, Date- 7.12.2023, Time- 11.37 a.m
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৪-১৫, পৃ. ৩৬৯
৫. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত) (মধ্যলীলা), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, দ্বাদশ মুদ্রণ- ১ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১২৯
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৩-১৪, পৃ. ৬৬
৭. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্র নাথ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১১, পৃ. ৯১
৮. Tagoreweb.in, Date- 7.12.2023, Time- 12.05 p.m
৯. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্র নাথ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১১, পৃ. ৩
১০. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্র নাথ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১১, পৃ. ৫১
১১. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত) (মধ্যলীলা), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, দ্বাদশ মুদ্রণ- ১ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১২৯
১২. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আদিলীলা), সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা- ০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ- ২১ চৈত্র, ১৩৬৯, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩, পৃ. ৩৬০
১৩. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, (পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত) (মধ্যলীলা), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, দ্বাদশ মুদ্রণ- ১ জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৪৬

Bibliography:

আচার্য, ড. দেবেশকুমার (সম্পাদনা), প্রবন্ধ বিচিত্রা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, নবম পরিমার্জিত সংস্করণ- ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, সরস্বতী পূজা।
গিরি, ড. সত্যবতী ও মজুমদার ড. সমরেশ (সম্পাদনা), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (প্রথম খণ্ড), রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ- রথযাত্রা ১৪২০/ ১০ জুলাই ২০১৩।
দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, কাব্য-সঞ্চয়ন (আমরা কবিতা), সত্যেন্দ্রনাথ, দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, সপ্তম কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ- ২০১১।
নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' (আদিলীলা),সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা- ০৯, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ- ২১ চৈত্র, ১৩৬৯, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), , মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৩-১৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), , মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৪-১৫।

মিত্র, নাথ শ্রীখগেন্দ্র ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (পরমভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, দ্বাদশ মুদ্রণ- ১ জানুয়ারি ২০০৫।

Prothomalo.com

Tagoreweb.in